ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

সমাজ পরিবর্তনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বা প্রাসঙ্গিকতা আছে কি নেই, এই প্রশ্নে মার্কসবাদী তত্ত্ব বা অনুশীলনের জগতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই, থাকতে পারে না। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে আধুনিক সমাজ শ্রেণী বিভক্ত ও শ্রেণী শাসিত সমাজ এবং রাষ্ট্র হল সেই শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার। এমন সমাজের ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তন রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন (পুরনো রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্র নির্মাণ) ছাড়া সম্ভব নয়। মার্কসবাদ একথাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে কোন শাসক শ্রেণীই স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে চলে যায় না— নতুন সমাজের জন্মের জন্য *ধাত্রী* হিসেবে চাই বলপ্রয়োগ (পাঠক লক্ষ্য করবেন মার্কস জননী নয়, ধাত্রীর ভূমিকার সঙ্গে বলপ্রয়োগের তুলনা করেছেন।)

ইউরোপীয়/উন্নত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে মার্কস শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়েও চর্চা করেছেন (''সম্ভব হলে শান্তিপূর্ণ, প্রয়োজনে সহিংস'')— কিন্তু শান্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে বা বাস্তবায়িত করতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বা এমনকি অনিবার্যতার কথা মার্কসবাদে ব্যাপকভাবেই স্বীকৃত।

আসলে সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রশ্নে দৃঢ় ও স্পষ্ট থেকে সংগ্রামের মঞ্চ ও রূপের প্রশ্নে মার্কসবাদ বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার সংগ্রামের মধ্যে ব্যাপক সমন্বয়ের কথাই বলে। লেনিনের ভাষায় কমিউনিস্ট কৌশলের মূল কথা হল পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা ও কোন একটি রূপ থেকে অন্য একটি রূপে দ্রুত সঞ্চরণ করা যাতে সব মিলিয়ে জনগণের শক্তি বৃদ্ধি হয় ও বিপ্লবী চেতনার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে।

সবকিছুকে মেলানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম ও বিমূর্তভাবে নয়, স্থান-কাল-পরিস্থিতি ও আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা ও অগ্রগতির কথা মাথায় রেখেই সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ ও তাদের আপেক্ষিক অগ্রাধিকার ও সমন্বয়ের প্রশ্নটি বিবেচিত হতে পারে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বড় আকারে সশস্ত্র সংগ্রামের সংগঠিত অনুশীলনের প্রথম উদাহরণ ছিল তেলেঙ্গানা। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই অধ্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অস্ত্র সমর্পণ ও সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহারের পথ বেছে নেন। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের মূলে ছিল এক বিরাট বিপ্লবী কৃষক জাগরণ। সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহৃত হলেও তেলেঙ্গানার মাটিতে সেই কৃষক জাগরণের ধারা কিন্তু অব্যাহত থাকে।

দু-দশক পরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সচেতন প্রচেষ্টায় নকশালবাড়ি গড়ে ওঠার সাথে সাথে আবার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্ন সামনে চলে আসে। তেলেঙ্গানা পর্যায়ের সিপিআই নেতৃত্বের মত সিপিএম নেতৃত্বও নকশালবাড়ির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু তেলেঙ্গানায় যা ঘটেনি ভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে নকশালবাড়ির ক্ষেত্রে সেটা ঘটল— নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে সিপিএমের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ দেখা দিল এবং নকশালবাড়ির ধারাকে ভিত্তি করেই নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠল— সিপিআই(এম-এল)। ফলে নকশালবাড়ির ধারা অনুশীলনে সাংগঠনিক কোন বাধা থাকল না।

নকশালবাড়ি পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামের যে প্রাথমিক রূপরেখা সামনে আসে তা সম্পূর্ণভাবেই কৃষক আন্দোলনের সূত্র ধরে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের সুপ্ত শ্রেণীঘৃণা, বিপ্লবী আত্মবিশ্বাস ও উদ্যোগকে জাগিয়ে তোলার জায়গা থেকেই তেভাগা-তেলেঙ্গানার অভিজ্ঞতা ও চীন বিপ্লবের অনুপ্রেরণা থেকে শ্রেণীশত্রু খতমের ধারণা সামনে আসে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ও স্বাধীন উদ্যোগকে সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁদের মধ্য থেকেই কম্যান্ডার গড়ে তোলা এবং উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের পরিবর্তে মূলত ঘরোয়া অস্ত্র ব্যবহারের উপরই চারু মজুমদার বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ছাত্র-যুব বা পেটিবুর্জোয়া পৃষ্ঠভূমির বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শহুরে সশস্ত্র কার্যকলাপ নয়, দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধই ছিল নকশালবাড়ি এবং সিপিআই(এম-এল)-এর প্রারম্ভিক পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মূল কথা।

কিছু তত্ত্ব ও অনুশীলন উভয় স্তরেই কিছুদিনের মধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রামের নামে বাড়াবাড়ি ও সাধারণীকরণ শুরু হয়ে যায়। খতমকে অভিযানের রূপ দিয়ে দেওয়া ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিশেষ রূপ হিসেবে তুলে ধরা, ''বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস''— চীনের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মাও-এর এই উক্তিকে আপ্তবাক্য হিসেবে গ্রহণ করা, খতম সব সমস্যার সমাধান করবে বা ''শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না'' এমন একপেশে সূত্রায়ণে পৌঁছে যাওয়া— এ সবই ছিল বাড়াবাড়ি, অতি সরলীকরণ বা ভ্রান্ত সূত্রায়ণ। শুধু নির্বাচন নয়, সমস্ত গণসংগঠন ও গণকার্যকলাপ ছেড়ে দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের নামে এই অনুশীলনকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে ভুলের পরিধি ও মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

ধাক্কার মুখে দাঁড়িয়ে চারু মজুমদারের শেষ লেখায় যেভাবে জনগণের স্বার্থকে আঁকড়ে ধরে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার এবং কংগ্রেসি আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ব্যাপক বামপন্থী কর্মীবাহিনী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার আহ্বান আসে তাতে অবশ্য স্পষ্টতই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দু-পা পিছু হটে নতুন ভাবে এগোনোর এক সংকেত পাওয়া যায়।

সত্তর দশকের ধাক্কার পর সিপিআই(এম-এল)-এর পুনর্গঠনের পালা শুরু হয়। পুনর্গঠনের নামে নকশালবাড়ি এবং সিপিআই(এম-এল)-এর বিপ্লবী মর্মবস্তুকেই নস্যাৎ বা নাকচ করে দেওয়ার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় নকশালবাড়ি এবং সিপিআই(এম-এল)-এর নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে। গত তিন দশকে এই নামকরা নেতারা কোথায় কী সৃষ্টি করতে পেরেছেন সেদিকে চোখ রাখলে আজও কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই রাজনৈতিক আত্মহত্যা বা বিলোপপন্থী অভিযানের বিপরীতে অনামী নিচুতলার নেতা ও কর্মীরাই প্রকৃত অর্থে সিপিআই(এম-এল)-কে বাঁচিয়ে রাখেন। বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন ও ব্যাপক গণরাজনৈতিক অনুশীলন ও উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম-এল) সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ধারা হিসাবে আবার উঠে আসে।

পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়ায় সত্তরের শেষ ভাগে এবং আশির দশকে সবচেয়ে বেশি যে দুটি রাজ্য শিরোনামে উঠে আসে তা হলো বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। এই দুই রাজ্যেই কৃষক আন্দোলনে একটা সশস্ত্র উপাদান বা মাত্রা ছিল। বিহারের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন, যদিও পটনা-জাহানাবাদ অঞ্চলে পার্টি ইউনিটি সংগঠনও সক্রিয় ছিল। অন্ধ্রে মূল ভূমিকা ছিল কোণ্ডাপল্লী সীতারামাইয়ার নেতৃত্বাধীন জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর ও চন্দ্রপুল্লা রেড্ডীর নেতৃত্বাধীন সংগঠনের যা কালক্রমে 'নিউ ডেমক্র্যাসি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আশির দশকের শেষ দিক থেকে বিহার ও অন্ধ্রের অনুশীলনে ও অভিজ্ঞতায় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বিহারে লিবারেশনের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন ভোজপুর ও পটনার গ্রামাঞ্চল থেকে মধ্য ও দক্ষিণ বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম বিহারের চম্পারণ, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ জেলাও নব্বইয়ের দশকে এই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে সামনে উঠে আসে। আলাদা ঝাড়খন্ড রাজ্য গড়ে ওঠার পর গিরিডি-হাজারিবাগ ও পালামৌ অঞ্চলে আন্দোলনের ও পার্টি প্রভাবের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি চোখে পড়ে।

বিহার ও ঝাড়খন্ডেসিপিআই(এম-এল)-এর এই অগ্রগতি অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে ঘটে যায়নি। রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট জমিদারদের নিজস্ব সেনা, সরাসরি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দমনপীড়ন, অপরাধী মাফিয়া জোটের হামলা, এমনকি যাঁরা নিজেদের বিপ্লবী বলে দাবি করেন সেই মাওবাদীদের (এককালে জনযুদ্ধ এবং এমসিসি না

ম আলাদা করে, পরবর্তীতে মাওবাদী নামে) দিক থেকেও ধারাবাহিক হিংসা— এসবের মোকাবিলা করেই আন্দোলন ও সংগঠন টিকে থেকেছে এবং এগিয়ে গেছে।

বিহার ও ঝাড়খন্ডে সিপিআই(এম-এল) আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতির প্রসঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সত্তরের দশকের শেষ পর্যায় থেকে গণআন্দোলন ও গণসংগঠন অনুশীলন শুরু করলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া মূলত আশির দশকের শেষভাগেই শুরু হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসংগ্রাম এক নতুন তীব্রতা ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও একথা সত্যি যে নির্বাচন বর্জনের শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণই বিহারের গ্রামাঞ্চলের নির্দিষ্ট অবস্থায় এক জঙ্গি শ্রেণীসংগ্রামের বার্তা বহন করে আনে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিহারের ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক জনগণ কখনোই ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি। সামাজিক উৎপীড়ন ও মর্যাদাহীনতা ও তীব্র আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনার সাথে সাথে রাজনৈতিক দাসত্ব ও অধিকারহীনতা— এই ছিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের অস্তিত্বের চালচিত্র। দলিত গরিব মানুষ পছন্দমত ভোট দেবে এ ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার। তাঁদের ভোটের ওপরেও ছিল সামন্ত প্রভুদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক মর্যাদা এবং জমি ও মজুরির প্রশ্নে জেগে ওঠা সিপিআই(এম-এল)-এর আন্দোলন যখন নির্বাচনের আঙিনাতেও ঢুকে পড়ল তখন সেই একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করল। আর তাই ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলিত-গরিবদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় আমরা দানোয়ার-বিহটার নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত হতে দেখলাম। এই নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে ভোজপুরের আরা সংসদীয় আসনে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইপিএফ [সিপিআই-(এম-এল) সমর্থিত গণরাজনৈতিক মঞ্চ] প্রার্থীর জয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের আত্মঘোষণাকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে সিপিআই(এম-এল)-এর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব ও নির্বাচনী সাফল্যকে ঠেকাতে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সুস্পষ্ট সমর্থনে গড়ে উঠল ঘাতকবাহিনী রণবীর সেনা।

১৯৯৬ থেকে ২০০০ এই পাঁচ বছরে একের পর এক গণহত্যায় ভোজপুর-পটনা-জাহানাবাদ-আরোয়াল-গয়া-ঔরঙ্গা-বাদের মাটিতে প্রায় শ-পাঁচেক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে রণবীর সেনার ঘাতকেরা। কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হলেও রাষ্ট্রযন্ত্র সবসময়ই প্রচ্ছন্ন মদত যুগিয়েছে এই ঘাতকবাহিনীকে। সেনা গড়ে ওঠার প্রাক্কালে ভোজপুরের এক সভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ প্রকাশ্যেই বলেছিলেন ''সিপিআই(এম-এল)-কে রুখতে নরকের শক্তির সাথেও আমি হাত মেলাতে প্রস্তুত।'' বহু নিন্দিত লক্ষ্মণপুর-বাথে গণহত্যার পর রণবীর সেনাকে কারা মদত যোগাচ্ছে তা অনুসন্ধান করার জন্য বিচারপতি আমীর দাসের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয় লালুপ্রসাদ সরকার। কিন্তু ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে সে কমিশনের কোন রিপোর্টই বেরোলো না। ২০০৫-এর নভেম্বর মাসে নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রথম কাজই হল আমীর দাস কমিশনকে ভেঙে দেওয়া। শোনা যায় কমিশনের রিপোর্ট তখন প্রায় তৈরি।

এহেন রণবীর সেনাকে মোকাবিলা করার প্রশ্ন মোটেই সহজ প্রশ্ন না। রাষ্ট্রযন্ত্রের মদত ছাড়াও জাতিগত ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্টভাবে ভূমিহার জাতি ও সাধারণভাবে সমস্ত উঁচু জাতির সাধারণ কৃষককেও এই সেনা তার পক্ষে করে নিয়েছিল। ফলে নিছক সামরিক কায়দায় এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। আর সশস্ত্র প্রতিরোধের অর্থ কখনোই গণহত্যার জবাবে পাল্টা গণহত্যা হতে পারে না। এমসিসি বা জনযুদ্ধ গোষ্ঠী সশস্ত্র প্রতিরোধের নামে পাল্টা গণহত্যার পথই বেছে নিয়েছিল— আর তার ফলে এই সমস্ত জমিদারবাহিনী বরং নিজেদের আরও বেশি সময় ধরে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এর বিপরীতে সিপিআই(এম-এল) পাল্টা গণহত্যার রাস্তা এড়িয়ে ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও গণ-প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হয়েছে— ইতিহাস প্রমাণ করেছে ভূমি সেনা থেকে রণবীর সেনা পর্যন্ত কোন জমিদার বাহিনীই শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপক প্রতিবাদ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের মুখে টিকে থাকতে পারেনি। অতি সম্প্রতি বাথে ও বাথানীটোলা গণহত্যার অপরাধে কিছু দোষী ব্যক্তিকে কোর্ট শাস্তি দিয়েছে— আইনি প্রক্রিয়াকেও এই পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাজটাও রীতিমতো লড়াই করেই সিপিআই(এম-এল)-কে সম্পন্ন করতে হয়েছে। একই কথা সিওয়ানের কুখ্যাত রাষ্ট্রীয় জনতা দল সাংসদ মহম্মদ সাহাবুদ্দিনেরও ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সিপিআই(এম-এল)-এর চৌতরফা ধারাবাহিক আন্দোলনেই আজ সাহাবুদ্দিন জেলের ভেতরে এবং নির্বাচনেও পরাজিত।

বিহার ও ঝাড়খন্ডেতিন দশক ধরে এভাবে গণভিত্তি ও বিপ্লবী রাজনৈতিক অবস্থানকে ধরে রাখতে পারাটা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সংগ্রামের বিভিন্ন মঞ্চকে ব্যবহার করা ও বিভিন্ন রূপকে সমন্বিত করার প্রশ্নে বহু শিক্ষাই এই অভিজ্ঞতার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সশস্ত্র সংগ্রামকে একমাত্র বা প্রধান রূপ হিসেবে গ্রহণ করে হিন্দী বলয়ের মূলস্রোতের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় অবশ্যই এভাবে এগোনো যেত না। বিহার ও ঝাড়খন্ডেএমসিসি এবং জনযুদ্ধের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিচার করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিছু পকেটে অবশ্যই এমসিসি (আজকের মাওবাদী) সংগঠন কিছু সশস্ত্র কার্যকলাপ গত দু-তিন দশক ধরে চালিয়ে যাচ্ছে— কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ের শ্রেণী সংগ্রাম বা রাজ্য রাজনীতিতে এই কার্যকলাপের কোন ভূমিকা বা প্রভাব নেই। ঝাড়খন্ডে মূলত ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা ও বিহারে মূলত রাষ্ট্রীয় জনতা দলের রাজনৈতিক আড়ালে এমসিসি তার কার্যকলাপ চালিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের মূল এলাকায় আপাত শান্তি বজায় রাখতে তারা জমি বা মজুরি সংক্রান্ত কোন লড়াই লড়ে না— শুধু মাঝে মাঝে গণআদালতের মাধ্যমে প্রতিপত্তি সাব্যস্ত করা ও সশস্ত্র কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়াটাই তাদের পরিচিত কাজের ধারা।

অন্ধ্রপ্রদেশে জনযুদ্ধ সংগঠনের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে আশির দশকে কৃষক ও বিপ্লবী ছাত্র ও সাংস্কৃতির আন্দোলনের নিরিখে অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহার মোটামুটি সমানতালেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামকেই প্রধান রূপ হিসেবে অবলম্বন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীকে গণসংগঠন ও গণআন্দোলনের ময়দান ছেড়ে জঙ্গলে সরে যেতে হয়। 'দমনের পরিস্থিতিতে আর কী-ই বা কর সম্ভব'— জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতৃত্বের এটাই ছিল উত্তর। প্রধান রূপ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াল সংগ্রামের একমাত্র রূপ— গণকার্যকলাপের নামে থাকল শুধু মানবাধিকার আন্দোলন।

আসলে সশস্ত্র সংগ্রামকেই পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে সংগ্রামের নির্ধারক রূপ হিসেবে গ্রহণ করলে এবং সমস্ত গণকার্যকলাপকে সশস্ত্র কার্যকলাপের শর্তাধীন করে তুললে সাধারণভাবে অন্য কিছুই করার থাকে না। অন্ধ্রের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল গণআন্দোলন থেকে সরে গেলেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি সরে থাকা জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হল না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তেলেগু দেশম অথবা তেলেগু দেশমের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করাটা ধীরে ধীরে তাদের নিয়তি বা অভ্যাসে পরিণত হল। ২০০৪ সালে খোলাখুলিভাবেই কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালেন জনযুদ্ধ/মাওবাদী নেতৃত্ব। নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্যাপক জয়লাভের পর মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডী মাওবাদীদের আলোচনার টেবিলে আহ্বান জানালেন।

২০০৪ সালের সেই পর্যায়ের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে মাওবাদীরা একরকম বিজয়ের আবেগে মেতে উঠেছিলেন। জেলায় জেলায় শহীদ স্মরণে বড় বড় গণসমাবেশের মাধ্যমে প্রমাণিত হল জনগণের মনে তাঁদের সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতি তখনও বিদ্যমান। জঙ্গলের ঘাঁটি থেকে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ টিভি ক্যামেরার বিরামহীন নজরদারিতে অতিক্রম করে নেতৃত্ব আলোচনার টেবিলে পৌঁছোলেন। অন্ধ্রের প্রচারমাধ্যমে তখন এমন একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যার তুলনা নেপালের বিজয়পর্ব বা পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি অপহৃত ওসি-র মুক্তি বৃত্তান্তের সঙ্গে করা যেতে পারে।

কিন্তু পট পরিবর্তন ঘটতে শুরু হল কিছুদিনের মধ্যেই। আলোচনার কোন রাজনৈতিক ফলাফল দেখা গেল না। দেখা যাবেই বা কী করে? ভূমি সংস্কার বা বন্দীমুক্তি প্রশ্নে যে প্রতিশ্রুতিই সরকার দিক না কেন সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করতে হলে যে ধারাবাহিক ও ব্যাপক গণআন্দোলন প্রয়োজন সেই গণআন্দোলনের কোন তত্ত্বগত বা প্রায়োগিক কাঠামোই তো মাওবাদী নেতৃত্বের কাছে ছিল না।

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হলেও যা নিয়ে আলোচনা হয়নি তাই ঘটল। মাওবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অস্ত্র ও অর্থসংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছে— এই অভিযোগে শুরু হল রাষ্ট্রের আক্রমণ। নির্বিচারে নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবরের ভিত্তিতে বাছাই করে। রাজ্য সম্পাদক সহ মাওবাদী রাজ্য নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই আক্রমণে নিহত হলেন— অথচ রাজ্যে তেমন কোন প্রতিবাদ দেখা গেল না, মাওবাদীদের সমর্থনে উঠল না কোন সহানুভূতির হাওয়া। আজ সালওয়া জুড়ুম বা গ্রিন হান্টের পরিবর্তে এই অন্ধ্র মডেলেরই ওকালতি করছেন দিগ্বিজয় সিং।

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ার ছবিটা আপাতদৃষ্টিতে অন্যরকম মনে হতে পারে। মাওবাদীদের নিজস্ব দাবি বা অরুন্ধতী রায়ের মত লেখিকা, গৌতম নওলাখার মত মানবাধিকার কর্মী বা রাহুল পণ্ডিতার মত সাংবাদিকের বর্ণনা অনুযায়ী দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদীদের গণসমর্থন ও সংস্কারধর্মী গণকার্যকলাপের একটা ছবি অবশ্যই বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই ছবির মধ্যেও যেটা লক্ষ্য করার মত ব্যাপার তা হলো এই এলাকা রীতিমত বিচ্ছিন্ন অনুন্নত এলাকা এবং এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে সরকারি 'উন্নয়নের' বার্তা যেমন পৌঁছায়নি, তেমনই শ্রেণীবিভাজন ও গঠনের প্রক্রিয়াও এখনও অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে। এমন এক এলাকায় টিকে থেকে সশস্ত্র শক্তি গড়ে তোলাটা অবশ্যই একটা বড় ব্যাপার— কিন্তু প্রশ্ন হল এর সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য কীভাবে নির্ধারিত হবে।

দান্তেওয়াড়া এলাকার নিরিখে বিচার করতে গেলে অবশ্যই সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনে মানবীয় মর্যাদা ও জীবনযাপনের মানের ক্ষেত্রে গত দু-তিন দশকে কিছুটা উন্নতি এসেছে। জনগণের চেতনা ও বা সংগঠন শক্তির উন্নয়নের প্রতিফলনকে যদি স্থানীয় শ্রেণীসংগ্রামের আয়নার খুঁজতে হয় তাহলে অবশ্য ছবিটা অত স্পষ্ট নয়। ওখানকার অরণ্য অর্থনীতিতে ঠিকাদার ও বনবিভাগের আমলাদের দাপট কিছুটা কমলেও শোষণ ও লুণ্ঠনের মাত্রা তেমন কমেনি। *আউটলুক* পত্রিকায় প্রকাশিত অরুন্ধতী রায়ের দীর্ঘ নিবন্ধ অনুযায়ী কেন্দুপাতার ঠিকাদাররা প্রতি বস্তায় আজও বারো-শ টাকা মুনাফা কামায় (মাওবাদীদের ১৩৫ টাকা 'কমিশন' বা 'কর' দেওয়ার পর)।

কেউ কেউ দাবি করেন, মাওবাদী কার্যকলাপের সাফল্য স্থানীয় শ্রেণীসংগ্রামের বা শ্রেণীচেতনার বিকাশের ভিত্তিতে নয়, বরং বিশ্বায়নের আগ্রাসী হামলাকে রুখে দেওয়ার ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। বিশ্বায়ন বা নব-উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণ গত দু-দশক ধরে জাতীয় জীবন ও অর্থব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত ও অনুভূত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠছে। কিন্তু এই প্রতিরোধের নেতৃত্বে মাওবাদীরা রয়েছেন এমন দাবি করার কোন তথ্য ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। *সেজ*-বিরোধী, উচ্ছেদ বিরোধি আন্দোলনের মানচিত্রের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই সেজের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে, জোর করে কৃষি জমি অধিগ্রহণ, গণ-উচ্ছেদ ও জীবিকা ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্দালন গড়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রের রায়গড়, পাঞ্জাবের বারনালা, উত্তরপ্রদেশের দাদরি, উড়িষ্যার জগৎসিংপুর-পারাদীপ (পস্কো-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র), কলিঙ্গনগর, কাশিপুর, পশ্চিমবাংলার সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের আন্দোলন এই পর্যায়ে বিশেষভাবে সামনে এসেছে। এই আন্দোলনের একটিও মাওবাদীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেনি— আন্দোলন গড়ে ওঠার পর মাওবাদীরা অবশ্যই তাঁদের কায়দায় আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

নব-উদারবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রশ্নে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যাবে না। নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা ও সুবিধাবাদী চরিত্র সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক-বীমা বা তেল-কয়লা-ইস্পাত অথবা রেল ও বিদ্যুতের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে গত দু-দশকে বারবার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং আক্রমণের তীব্রতাকে স্তিমিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বেসরকারিকরণকে ঠেকানোর প্রশ্নে এই আন্দোলনের অবশ্যই একটা ভূমিকা থেকেছে। এই শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মাওবাদীদের কোন ভূমিকার কথা স্বাভাবিকভাবেই কেউ উল্লেখ করতে পারবেন না।

দান্তেওয়াড়ার সাফল্যকে সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা ও প্রক্রিয়া নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নের জবাবে মাওবাদী নেতা গণপতির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। গণপতির মতে, সশস্ত্র কার্যকলাপ সমগ্র মাওবাদী কার্যকলাপের ২০ শতাংশ— বাকি ৮০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কাজ ও মতাদর্শগত-রাজনৈতিক কাজ। প্রশ্নটা আনুপাতিক নয়, প্রশ্নটা হল কোন কাজটা নির্ধারক ও নেতৃত্বমূলক। একথা অনস্বীকার্য যে মাওবাদীদের নিজেদের চোখে এবং বাইরে থেকে দেখা দর্শক-ভাষ্যকার সকলের চোখেই সশস্ত্র কার্যকলাপই হল মাওবাদী পরিচিতির মূল কথা। গণপতি আরও বলেছেন যে, যে কোন সফল সশস্ত্র কার্যকলাপ নিজেই একটি বড় রাজনৈতিক কাজ। উদাহরণস্বরূপ তিনি উড়িষ্যার নয়াগড় অস্ত্রাগার দখলের কথা উল্লেখ করেছেন, মাওবাদী মহলে যা 'অপারেশন রোপওয়ে' নামে পরিচিত। গণপতির মতে দক্ষিণ উড়িষ্যার মলকানগিরি-কোরাপুট অঞ্চল থেকে উঠে এসে একেবারে ভুবনেশ্বরের দোরগোড়ায় এই অপারেশন চালানোর জন্য বেশ কয়েক মাস ধরে দীর্ঘ 'রাজনৈতিক' কাজ চালাতে হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে তাঁর মাথায় আছে সশস্ত্র কার্যকলাপের প্রস্তুতি। শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি-মধ্যবিত্ত মানুষকে স্বাধীন শক্তি হিসেবে দাঁড় করানো, শাসক শ্রেণীর নীতি ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত পাল্টা নীতি ও ধ্যানধারণার প্রচার করা এবং বিকাশমান পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি ও শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে নিয়ে আসার ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া— রাজনীতির এই মূল কথাটাই তাঁর একপেশে সংকীর্ণ ধারণাতে অনুপস্থিত।

সশস্ত্র কার্যকলাপ রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে থাকছে না বা রাজনীতির সেবা করছে না— এই অভিযোগের মোকাবিলা করতে গণপতি সশস্ত্র কার্যকলাপকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ হিসেবে উপস্থাপিত করার চেষ্টায় নেমেছেন। তাঁর এই চেষ্টা দেখে লেনিনের *কী করিতে হইবে* বা *হোয়াট ইজ টু বি ডান* বইটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই বইতে অর্থনীতিবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন দেখিয়েছিলেন অর্থনীতিবাদীরা অর্থনৈতিক সংগ্রামকেই রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে দেখেন বা অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকেই রাজনৈতিক সংগ্রামে উপনীত হওয়া সম্ভব এমন একপেশে ধারণা ও অনুশীলনে আবদ্ধ থাকেন। এই ধারণাকে খণ্ডন করে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের জমিতে জীবন্ত রাজনীতির অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন লেনিন— কিন্তু অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভূমিকাকে তিনি খারিজ করে দেননি। অর্থনৈতিক সংগ্রামের জায়গায় সশস্ত্র কার্যকলাপকে বসিয়ে দিলেই রাশিয়ার অর্থনীতিবাদীদের জায়গায় আমরা আজকের ভারতীয় মাওবাদীদের দেখতে পাব।

গণপতি আশা ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমান যুদ্ধকে তাঁরা যদি আরও দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যেতে পারেন তখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আর তখন নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামনে আসবে। গণপতি যে কথা বলেননি তা হল সেই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মাওবাদীরা কীভাবে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ভারতের মাটিতে জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। জরুরি অবস্থা চালিয়ে যাওয়া শাসক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হয়নি, সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হয়েছে— এই প্রক্রিয়ায় শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক শিবিরের চেহারা পাল্টেছে, কিন্তু শাসকশ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদি আধিপত্য খর্ব হয়নি।

সরাসরি না বললেও হয়তো নেপালের উদাহরণ কোথাও গণপতির উত্তরের মধ্যে লুটিয়ে আছে। নেপালে দশবছর 'জনযুদ্ধ' অনুশীলনের পর রাজতন্ত্রের সংকটের পরিস্থিতিতে মাওবাদীরা রাজনৈতিক অনুশীলনে গণআন্দোলনের ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং বড় আকারের সাফল্য অর্জন করেন। ভারতের মাওবাদীদের ক্ষেত্রে যাঁরা এই উদাহরণ উপস্থাপিত করেন তাঁদের অবশ্যই তিনটি কথা মাথায় রাখতে হবে।

প্রথমত, নেপাল আর ভারতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। নেপালের আন্দোলন আজ যে পর্যায়ে আমরা সে পর্যায় দীর্ঘদিন আগে পেরিয়ে এসেছি। পরিস্থিতির নিরিখে বা সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে নেপাল ও ভারতের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের কথা মাথায় রাখতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, নেপালের মাওবাদী ও ভারতের মাওবাদীদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নেপালের মাওবাদীরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছেন, ভারতের মাওবাদীরা বলতে গেলে এককথায় সেই পথকে খারিজ করে দিয়েছেন। সর্বোপরি, নেপালের বর্তমান অবস্থার কথাও মাথায় রাখতে হবে। রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যত সহজ ছিল নতুন সংবিধান রচনা ও প্রজাতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন ততটাই কঠিন প্রতিপন্ন হয়ে চলেছে। নেপালি সমাজের শ্রেণীসংগ্রামের আবর্তে রাজনৈতিক উদ্যোগ ধরে রাখার জটিলতা আজ মাওবাদীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

শুধুমাত্র সশস্ত্র কার্যকলাপের কলেবরের ভিত্তিতে বিচার করলে আজকের মাওবাদীরা হয়তো অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনে বা সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়েই সশস্ত্র সংগ্রামের মূল্যায়ন সম্ভব। আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা বা প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে আত্মরক্ষা বা গণপ্রতিরোধের স্বার্থে সশস্ত্র উপাদানকে কাজে লাগানো আর সশস্ত্র সংগ্রামের নামে ও স্বার্থেই সব কিছু কাজে লাগানোর চেষ্টা করা— এই দুইয়ের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য তা অনুধাবন করা আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বড় প্রশ্ন।

যে কোন জঙ্গি আন্দোলন ও বিরোধিতাকে মাওবাদ আখ্যা দিয়ে এবং মাওবাদকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নিরিখে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করে আজ ভারতের শাসকশ্রেণী সবুজ শিকার অভিযানে নেমেছে। আজ এই সবুজ শিকার অভিযানে সহযাত্রী হিসেবে রয়েছেন ক্ষমতার থাকা সেই 'বামপন্থীরা' যাঁরা বুর্জোয়া সরকার পরিচালনায় নিজেদের 'দক্ষতাকেই' মার্কসবাদ হিসেবে তুলে ধরেন। এই অশুভ আঁতাতকে অবশ্যই খারিজ করতে হবে, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের নামে মাওবাদী বন্ধুরা যে নৈরাজ্যবাদী-সমরবাদের অনুশীলনে আটকে আছেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই অনুশীলনেরও নির্মোহ সমীক্ষার সময় এসেছে।